ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-V, May, 2026, Page No. 2041-2050
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.05W.465

বিংশ শতকের ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ ও নজরুলের মানবতাবাদী দর্শনে 'রুদ্রমঙ্গল' প্রবন্ধগ্রন্থের প্রাসঙ্গিকতা: একটি মননশীল সাহিত্যিক মূল্যায়ন

ড. সাগর সরকার, *সহকারী অধ্যাপক, জেআরএস কলেজ, জামালপুর, বিহার, ভারত*

Received: 03.05.2026; Accepted: 29.05.2026; Available online: 31.05.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The literary poet Kazi Nazrul Islam is primarily known to us as the "Rebel Poet." However, within him, the talents of a novelist, playwrighter, and essayist was equally radiant. The essay collection "Rudramangal" discusses a wide range of diverse themes. In these essays, nationalist and humanist ideas are blended, along with a firm determination to protect the country's independence and sovereignty. With the aim of freeing colonized India, he called upon the youth of the nation to rise, while also urging national leaders to work equally toward liberating the country from subjugation. Through the various essays in "Rudramangal", he sought to awaken a sleeping nation. He inspired a stagnant, self-doubting, and subjugated people to become motivated in the struggle for independence. Regardless of caste, religion, or creed, he urged the people of India to rise above communalism and embrace the ideals of humanity. The book was written with the goal of awakening a nation long burdened by caste conflicts, the shame of passive defeat, a life without protest, and deep inertia. Published in 1927, "Rudramangal" contains eight essays: 'Rudramangal' 'Amar Path', 'Moharram', 'Bishbani', 'Khudiramer maa, 'Dhumketur Path', 'Mandir Mosjid', and 'Hindu-Muslim'. At a time when the country was under foreign rule, the suffering of Indians was at its peak, communal riots were spreading hatred, and the nation lacked self-confidence, this book was composed in the midst of such a crisis. In these essays, Nazrul anticipates the arrival of a fierce, transformative force (symbolized as Rudra). Just as creation follows destruction, he believed that the people of colonized India would ultimately triumph in their struggle for rights, overthrow the mighty British Empire, free Mother India from chains, and achieve independence.

Keywords: Rudramangal, Imperialism, Humanism, independence, communalisms

সাহিত্যিক কবি নজরুল ইসলামকে আমরা মূলত বিদ্রোহী কবি হিসেবে জানি। কিন্তু তাঁর মধ্যে উপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক প্রতিভা সমানভাবে প্রজ্জ্বলিত ছিল। আলোচ্য 'রুদ্রমঙ্গল' প্রবন্ধগ্রন্থটিতে বহু বৈচিত্র্যমুখী বিষয় আলোচনা রয়েছে। প্রবন্ধগুলিতে জাতীয়তাবাদী ও মানবতাবাদী ভাবধারা যেমন সংমিশ্রণ ঘটেছে তেমনি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার দৃঢ়সংকল্প রয়েছে। পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে দেশের তরুণ সমাজকে উজ্জীবিত করা থেকে শুরু করে দেশনেতাকেও দেশকে পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে

সমানভাবে আহ্বান জানিয়েছেন। 'রুদ্রমঙ্গল' প্রবন্ধগ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধগুলির মধ্যদিয়ে ঘুমন্ত জাতিকে জাগানোর চেষ্টা করেছেন। জড়তাগ্রস্ত, হীনমন্য, পরাধীন জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রাম উদ্দীপ্ত হতে প্রেরণা জুগিয়েছেন। জাতি ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে ভারতবাসীকে মানবতার মন্ত্রে দীক্ষিত হতে আহ্বান জানিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে জাতপাতের দ্বন্দ্ব, সহনশীল পরাজয়ের গ্লানি, প্রতিবাদহীন জীবনশৈলী, জড়তাগ্রস্থ- ঘুমন্ত এই জাতিকে জাগানোর লক্ষে 'রুদ্রমঙ্গল' প্রবন্ধগ্রন্থের প্রণয়ন। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আজহার ইসলাম বলেছেন-

> "রুদ্রমঙ্গলগ্রন্থে নজরুলের বিদ্রোহী সত্তার পরিচয় আছে। কবি বিপ্লবী মনোভাব নিয়ে ব্যক্ত করেছেন জাতীয় জাগরণের বাণী।"[১]

'রুদ্রমঙ্গল' প্রবন্ধগ্রন্থে (১৯২৭) মোট আটটি প্রবন্ধ রয়েছে। এগুলো হলো- 'রুদ্রমঙ্গল', 'আমার পথ', 'মোহররম', 'বিষবাণী', 'ক্ষুদিরামের মা', 'ধূমকেতুর পথ', 'মন্দির মসজিদ' এবং 'হিন্দু-মুসলমান'। স্বদেশ যখন পরাধীন, ভারতবাসীর দুর্দশা চরমে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা একে অপরের প্রতি হিংসাত্মক মনোভাব, জাতির মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব, এই এক সংকটকালীন পরিস্থিতির মধ্যে কাজী নজরুল ইসলামের 'রুদ্রমঙ্গল' নামক গ্রন্থটির প্রণয়ন। প্রাবন্ধিক রুদ্রদেবের আগমন প্রত্যাশা করেছেন। তাঁর আবির্ভাবে যেমন প্রলয়ের পরে সৃষ্টি আসে; নজরুলের বিশ্বাস ঠিক তেমনি পরাধীন ভারতবাসী তাদের নিজের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের জয়ী হয়ে ব্রিটিশ সরকারের সুসজ্জিত সাম্রাজ্য ধ্বংস করে ভারতমাতাকে শৃঙ্খলমুক্ত করে পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করে তুলবে।

কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যশৈলীর মূলভিত্তি হল বিদ্রোহাত্মক সুর। তিনি একাধিক কাব্য কবিতায় রুদ্ররূপ শিবের প্রসঙ্গ এনেছেন। কারণ শিব হলেন ভীষণ ও প্রলয়ঙ্করী। তিনি কল্যাণকারী। সৃষ্টি ও সংহারের মূর্তমান প্রতীক। তাই তার সাহিত্য সৃষ্টিতে বারবার রুদ্ররূপ শিবের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। তৎকালীন সময়ে উগ্র সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশশক্তি যে সুসজ্জিত সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল তার ধ্বংসের একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ভারতীয়দের উপর যে অন্যায় অত্যাচার, নির্মম শাসন-শোষণ, বঞ্চনার ও অবিচার তৎকালীন সময়ে চলেছিল তার বিরুদ্ধে কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে ভিন্ন কাব্য- কবিতা এবং প্রবন্ধে। আলোচ্য '**রুদ্র মঙ্গল**' প্রবন্ধটিতে প্রাবন্ধিক তৎকালীন সময়ে ব্রিটিশ সরকারের কুশাসন, সামাজিক ব্যভিচার, অন্যায়-অত্যাচার, পরাধীন ভারতীয়দের দুর্দশা, মানুষের ভীরু ও নিষ্ক্রিয়তার চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে তিনি রুদ্ররূপ শিবের আগমন প্রত্যাশা করেছেন। কারণ রুদ্ররূপী শিবের প্রলয় নৃত্যে সমস্ত রকম অমঙ্গল, পাপের বিনাশ হয়ে পুণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উগ্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কুশাসনের ফলে জাতির যে দুর্দশা, পরাধীন ভারত মাতার উদ্ধার ও নৈতিক অবক্ষয়ের থেকে মুক্তির জন্য রুদ্ররূপী কোন শুভাকাঙ্ক্ষী তরুণ সমাজের আগমন প্রত্যাশা করেছেন। পরাধীন ভারতবাসী নিরুপায়, বিপন্ন। তাদের শুধু ক্রন্দন আর হা হুতাশ করা ছাড়া কোন উপায় নেই। কবি তরুণ সমাজকে এগিয়ে আসতে বলেছেন। কারণ বিপন্ন ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারের গোলামী করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তারা তাদের প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। একমাত্র তরুণ সমাজই পারে তাদেরকে উদ্দিপ্ত করে তাদের মুখে প্রতিবাদের ভাষা গড়ে তুলতে, সাহস জুগিয়ে, সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। প্রাবন্ধিক জাতির মধ্যে আত্মসম্মান ও পৌরুষত্ব অভাব অনুভব করেছেন। তাই বারবার আঘাতে দেবতাকে (শিবরূপী তরুণ সমাজ) আহবান করেছেন। এ জাতির প্রতি নজরুলের একরাশ অভিমান কারণ এদের মুখে নেই কোন প্রতিবাদের ভাষা, অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার, শাসন-শোষণ, বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে শুধু অশ্রু বিসর্জন করে নিজেকে ভাগ্যের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকে।

> "যারা চোখের সামনে মায়ের অপমান দেখে শুধু ক্রন্দন করে, প্রতিকারের পন্থার অন্বেষণে উন্মত্ত উল্লাসে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে না! অবমানিত হয়ে যাদের চোখে অগ্নিস্ফনিঙ্গ নির্গত হয় না"[২]

তাই পরাধীন ভারতমাতার বীভৎস রূপ দেখেও তারা নীরব থাকে। দানবরূপী ব্রিটিশ সরকারের হাতে ভারতমাতা লাঞ্ছিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। প্রাবন্ধিকের ভাষায়-

> "মাকে আমার উলঙ্গ করে টেনে নিয়ে চলেছে আর চাপকাচ্ছে যে, সে দানবও নয়, দেবতাও নয়, রক্তমাংসের মানুষ। ধীরে ধীরে পিছনে চলেছে তেত্রিশ কোটি আঁধারে যাত্রী।"[৩]

নজরুলের বিশ্বাস শিব তাণ্ডবেই পরাধীন ভারতমাতার শৃঙ্খলামুক্ত সম্ভব। ঘুমন্ত জাতিকে জাগানো সম্ভব। তাই তিনি শিবের ভৈরব, রুদ্র প্রলয়ঙ্কর রূপের আহবান করেছেন। কারণ শিব তাণ্ডবের প্রলয় নৃত্যের মধ্যেই রয়েছে নবজন্মের সম্ভাবনা। এই অন্যায়-অবিচারে, শাসন-শোষণ ব্যভিচার, জড়তাগ্রস্থ কুশাসনের অবসান ঘটে প্রতিষ্ঠিত হবে সুশাসন। "স্তূপীকৃত শবের মাঝে শিবের জটার কচি শশী হেসে উঠুক।"[৪] আর তা সম্ভব হবে দেশের মেহনতী, কৃষক, শ্রমজীবী মানুষের সমবেত প্রয়াসে। ঐক্যবদ্ধ শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম, বিপ্লব, বিদ্রোহ ব্রিটিশ সরকারের ভিতকে নড়িয়ে দিতে সক্ষম।

> "যারা তোমাদের পায়ের তলায় এনেছে, তাদের তোমরা পায়ের তলায় আনো। সকল অহংকার তাদের চোখের জলে ডুবাও। নামিয়ে নিয়ে এসো ঝুটি ধরে ওই অর্থ পিসাচ যক্ষগুলোকে।"[৫]

প্রবন্ধটির মধ্যে দিয়ে তিনি একটি বিপ্লবী চেতনার দিক তুলে ধরেছেন।

'আমার পথ' প্রবন্ধটিতে কাজী নজরুল ইসলাম সত্যের সন্ধান, সত্যের প্রকৃত পথ এবং তার সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকার যাত্রা পথ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন একমাত্র সত্যের কাছেই মাথানত করা যায়। তার এই যাত্রা পথে সত্য হলো নিত্য সঙ্গী। শাসকের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করতে পারে একমাত্র এই সত্য। তিনি মনে করেন রাজভয়, লোকভয় কোন কিছুই তাকে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। আর এই সত্যকে অবলম্বন করেই ধূমকেতুর পথ চলা। তিনি মনে করেন দেশমাতা এবং সমগ্র ভারতবাসীকে যারা বন্দী করে রেখেছে সেখান থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় 'ধূমকেতু'। সত্যকে সঙ্গে নিয়ে এই ধুমকেতুর রথে চড়ে নির্ভীকভাবে তিনি তার লক্ষ্যে পৌঁছাবেন। 'আমার পথ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক নজরুল 'পথ' বলতে 'সত্যের পথের' কথা বলেছেন। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন সত্যের সঙ্গে কোন কিছুই আপস নয়। এর জন্য সবকিছু বিসর্জন করা যায় এমনকি রাজভয়, লোকভয় তুচ্ছ বলে মনে হয়। তিনি মনে করেন ভয়কে জয় করতে না পারলে, সত্যকে চিনতে না পারলে প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। জীবনযুদ্ধে চলার পথে ভয়কে প্রশ্রয় দিলে সত্যের পরাজয় ঘটে। তাই সত্যকে চিনতে পারলেই ভয়কে জয় করা যায়। সত্যের প্রতি যার অবিচল আস্থা-বিশ্বাস আছে সে জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়। তিনি বাইরে জগতের ভয়কে এমন কি শাসকের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করেছেন। সমস্ত পরাধীনতা , বন্ধন মুক্তি তার কাঙ্খিত লক্ষ্য; আর এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সত্যকে সঙ্গী করে " ধূমকেতু" তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে।

প্রাবন্ধিক 'সত্যের' জয়গান করেছেন কারণ সত্য পথভ্রষ্ট পথিককে আলোর দিশা দেখায়, সত্যের পথে আনে, নির্ভীক মনের মানুষ গড়ে তোলে ভয়কে জয় করতে শেখায়। সত্যকে চিনলে, নিজের প্রতি বিশ্বাস থাকলে সকল ভয়কে জয় করা যায়। অর্থাৎ মিথ্যা মানুষকে ভীত, ত্রস্ত, পরনির্ভরশীল করে তোলে। সত্যের পথে থাকলে কেউ তাকে ভয় দেখিয়ে পদানত করতে পারবে না। প্রাবন্ধিক মনে করেন নিজেকে চেনার এবং নিজের আত্মাকে চেনার সহজ উপায় সত্যকে আপনার বলে জানা, সত্যকে নিজের গুরু-পথপ্রদর্শক হিসেবে মনে করা। 'দম্ভ' এবং 'অহংকার' কখনো কখনো ভালো। মিথ্যা মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতা আনে। সেই সঙ্গে পৌরুষত্বেরও। মিথ্যা বিনয় মানুষকে চাটুকারিতায় পরিণত করে। মানুষ পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আত্মাবিকাশে বাঁধা পায়। তাই প্রাবন্ধিক বলেছেন "ও রকম মেয়েলি বিনয়ের চেয়ে অহংকারের পৌরুষ অনেক-অনেক ভালো"। নিজের উপর আস্থা, নিজেকে চেনা, অবিনয় ভাব প্রদর্শন, অন্যায়ের কাছে মাথানত না করা, এর মধ্য

দিয়েই নিজের প্রতি আস্থা এবং সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রকৃত সত্যের সন্ধান এবং আত্মশক্তি বিকাশ এর মধ্যদিয়েই আত্মনির্ভরতা আসে। যার নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস নেই, আত্মশক্তি ও সত্যের সন্ধান জানেনা সেই পরনির্ভরশীল। তাই আত্মনির্ভরতা অর্জনের একমাত্র পথ পরনির্ভরশীলতাকে বর্জন, নিজেকে জানা, সত্যের অনুসন্ধান করতে শেখা। নজরুলের ভাষায়-

> "আত্মাকে চিনতে পারলেই আত্মনির্ভরতা আসে। এই আত্মনির্ভরতা যেদিন সত্যি সত্যি আমাদের আসবে সেদিনই আমরা স্বাধীন হব তার আগে কিছুতেই নয়।"[৬]

মিথ্যাকে অনুসন্ধান করতে শিখলে সত্যের প্রতি তার অবিচল নিষ্ঠা আসে। মিথ্যাকে সেই ভয় পায় যার মনে অসৎ উদ্দেশ্য থাকে। আর এই মিথ্যাকেই একমাত্র জয় করা যায় সত্যের মধ্য দিয়ে। সত্য মানুষের মনে জন্ম দেয় আত্মনির্ভরতা এবং নির্ভীক মানসিকতা। আর যেদিন আত্মনির্ভরিতা এবং নির্ভীক মানসিকতার নিজের মধ্যে জন্ম নেবে সেদিনই আমরা সমস্ত রকম বন্ধন থেকে মুক্ত হব। তাই প্রাবন্ধিক বলেছেন একমাত্র সত্যের কাছেই মাথানত অন্যত্র নয়। আত্মউপলব্ধির মধ্য দিয়ে প্রকৃত সত্যের সন্ধান সম্ভব। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র অবলম্বন হলো নিজের প্রতি বিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতা। মহাত্মা গান্ধী যে 'স্বাবলম্বী' হওয়ার কথা বলেছেন তার অর্থ আমরা না বুঝে তাঁর প্রতি আমরা 'স্বাবলম্বী' হয়ে পড়েছি। আমরা ভেবেছি তিনি একমাত্র অবলম্বন, তিনি ছাড়া পূর্ণস্বরাজ অর্জন সম্ভব নয়। আর এই আত্মনির্ভরতার অভাবই আমাদের পরাধীন করে রেখেছে। নজরুলের ভাষায় "এই পরাবলম্বনই আমাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেললে। একেই বলে সবচেয়ে বড় দাসত্ব।" যেদিন আমরা আত্মনির্ভরশীল হতে শিখব সেদিন আমাদের পরাধীনতার বন্ধন মুক্তি ঘটবে।

ধূমকেতু এর উদ্দেশ্য হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভাজন নয়। জড়তাগ্রস্থ সমাজ, দেশ ও জাতি অত্যাচারিত হতে হতে তাঁরা যে প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে তা তাদের কণ্ঠে প্রতিবাদের ভাষা জাগিয়ে তোলা। প্রলয় যদি না আসে নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই; তাই এই পচনশীল-জড়তাগ্রস্থ সমাজব্যবস্থা ও ব্রিটিশ সরকারের সুসজ্জিত সাম্রাজ্য ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়েছে। জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, ধর্মীয় বিভাজন, সামাজিক শ্রেণী বৈষম, ব্রিটিশ সরকারের চাটুকারিতা, প্রতিবাদহীন ভাষা, দেশ ও জাতির উপর চেপে বসেছে। এইসব কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে রুদ্ররূপী প্রলয়শঙ্খ বাজাতে পারলে তবেই পচনশীল-জড়তাগ্রস্থ সমাজ ও ব্রিটিশ সরকারের সুসজ্জিত সাম্রাজ্যের ইমারত ভিত্তি ভেঙে পড়বে। নজরুলের বিশ্বাস তা আনতে পারবে তাঁর 'ধূমকেতু'। ধূমকেতুর আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, প্রলয়ঙ্করী, তেমনি প্রচুর সৃষ্টির সম্ভাবনাময়। নজরুল মনে করেন এই 'ধূমকেতু' পত্রিকার মধ্য দিয়েই আসবে সমস্ত রকম বন্ধন থেকে মুক্তি। ভারত মাতাকে শৃঙ্খলমুক্ত করে তাকে পুনরায় সম্মান ফিরিয়ে দিতে। নজরুলের সম্পাদিত 'ধূমকেতু' কারো কাছে মাথা নত করবেনা। দেশের যারা শত্রু তাদের বিরুদ্ধে সে হবে মুক্তকণ্ঠ। সে কোন রকম মিথ্যা, ভন্ডামিকে প্রশ্রয় দেবে না। সত্য কথা নির্ভীকভাবে দীপ্ত কণ্ঠে প্রতিবাদের ভাষার মধ্য দিয়ে তুলে ধরবে। ধুমকেতু সর্বদা সত্যের পথে চলবে। নজরুলের 'ধূমকেতু' সমস্ত রকম সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে। তার কাছে ধর্ম অপেক্ষা মানবিক চেতনায় গ্রহণীয়। হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ের মূল কারণ অনুসন্ধান করা এবং তার পরিত্রাণের উপায় খুঁজে বের করা ধুমকেতুর মূল উদ্দেশ্য। 'ধূমকেতু' যেদিন মহৎ উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হবে সেদিন ধূমকেতুর আলো নিভে যাবে।

'বিষবাণী' প্রবন্ধে নজরুল ইসলাম তরুণ সমাজকে নাগশিশুরূপে কল্পনা করেছেন। নজরুলের বিশ্বাস একমাত্র এই তরুণ সমাজই পারবে বিষধর নাগিনীর তুল্য বিষ ছড়িয়ে দেশদ্রোহীদের বিনাশ করতে। যারা জাতীয়তাবাদ ও মানবতাবাদের পরিপন্থী, যারা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে নজরুল তাদের বিরুদ্ধে নাগিনীরূপ তরুণ সমাজকে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বলেছেন। এই তারুণ্য শক্তির

কাছে পরাজয় ঘটবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির । তরুণরা রুদ্ররূপী। এই রুদ্র-তেজের কাছে সবকিছুর বিনাশ হবে। যুগে যুগে যত বিপ্লব বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে তার চালিকা শক্তিরূপে রয়েছে তারুণ্যশক্তি। এই তারুণ্যশক্তি নাগিনীর বিষের তুল্য । তরুণদের মধ্যে রয়েছে সেই বিষের অগ্নিময় জ্বালা। পৃথিবীর কোন বন্ধন, শাসকের কোন কারাগার তাদেরকে বন্দী করে রাখার ক্ষমতা নেই। এমন কোন ফাঁসির মঞ্চ নেই যার ভয়ে তারা ভীত হয়ে পড়বে। তাদের দারুণ তেজে বন্দিশালার দরজা গলে খসে পড়বে। প্রাবন্ধিক তরুণ সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তাঁদের শক্তি, তেজ সঞ্চয় করতে। বিষবাষ্প তুল্য এই শক্তি, তেজ যেন শাসকের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যেও এক আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

> "এত বিষ এমন বিষ যা শুধু জ্যান্ত অবস্থাতেই অত্যাচারকে দগ্ধে মারবে না, মরবার পরও যে বিষ শ্বাশ্বত সম-তেজা সম উগ্র হয়ে থাকবে।"[৭]

তারুণ্যশক্তি অজেয়, অপরিমে, বন্ধনহীন, নির্ভয় সে আপন পথে আপোসহীন ভাবে এগিয়ে চলে। অন্যায় অত্যাচারের কাছে মাথা নত না করে তীব্রগতিতে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। তাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে জ্বলে আগুন, কপালে জলে অগ্নিশিখা। এই অগ্নিশিখায় কারাগারের লৌহ কপাট, ফাঁসির দড়ি, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সুসজ্জিত সাম্রাজ্য পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। নজরুল ইসলাম নাগশিশুরূপী তরুণদের বিষতুল্য শক্তি সঞ্চয় করতে বলেছেন। কারণ তারাই একমাত্র পারবে দেশদ্রোহীদের উচিত শিক্ষা দিতে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পতন ঘটিয়ে স্বাধীন সূর্যোদয় ঘটাতে। এই তারুণ্যশক্তির তেজ এতই জীবন্ত ও শাশ্বত চিরন্তন যে এর বিনাশ নেই। স্বদেশসংগ্রামী তরুণসমাজের কাছে প্রেম, প্রীতি ভালবাসা, নিছক মায়াময় প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। তারা এসব কিছুর ঊর্ধ্বে। এসব কিছু তাদের কাছে ভন্ডামি, বিদ্রুপ, প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়। ফাঁসিরমঞ্চ তাদের কাঙ্খিত। ফাঁসির দড়ি তাদের প্রিয়ার বাহুর বন্ধন। মৃত্যুকে জীবনের ব্রত করে সম্মুখ সমরে, আপসহীন লড়াইয়ে প্রাণ বিসর্জন তাদের জীবনের গৌরব। এই তরুণসমাজ অবিনশ্বর। তাদের একজনের মৃত্যুতে হাজারো তরুণ সমাজ তার পাশে এসে দাঁড়ায়। স্বদেশ প্রেমের নেশায়, স্বদেশ প্রেমে উজ্জীবিত হয়ে একজন তরুণের মৃত্যুতে রক্ত বীজের তুল্য হাজার হাজার তরুণ সমাজের জন্ম হয়। দেশ সেবার কাজে নিযুক্ত তরুণরা নির্ভীক।

দেশের মধ্যে যে দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক রয়েছে তাদের প্রতি এই তরুণ সমাজের বিদ্রোহ। এই দেশদ্রোহীরা দেশ জয়কারী সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর। তাই তরুণসমাজ চায় মহাকালরূপ ধারণ করে এই দেশদ্রোহীদের এমন বিভীষিকাময় শাস্তি দিতে যাতে আর আর কোন দেশদ্রোহী দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা থেকে বিচ্যুত না হয়। দেশদ্রোহীদের বিনাশ করাই তরুণদের একমাত্র লক্ষ্য। তারা যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন, তাদেরকে খুঁজে বের করে আনে এবং তাদের শাস্তি প্রদান করে এই তরুণরা। তরুণরা কালসাপ হয়ে তাদের দংশন করবেই। প্রাবন্ধিকের ভাষায়-

> "আমরা দেশ শত্রু বিভীষণের মহাকালান্ত কাল। আমরা অকাট্য ব্রহ্মশাপ। পরীক্ষিতের মত, লক্ষিন্দরের মত দুর্ভেদ্য ছিদ্রহীন দুর্গের মধ্যে থাকলেও দেশবিদ্রোহীকে আমরা রক্ষক হয়ে সূত্ররূপী কাল সাপ হয়ে দংশন করি।"[৮]

ক্ষুদিরামের মা: ১৯০৮ সালে ১৮ বছর বয়সে নির্ভীক ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। ভারতমাতাকে শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য, উগ্রসাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের হাত থেকে ভারতবাসীকে উদ্ধারের কামনায়, বিপ্লবী বীর ক্ষুদিরাম বসু নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। শহীদের এই আত্মবলিদান বৃথা যায়নি পরবর্তীতে তাঁর এই বলিদান হাজার হাজার ক্ষুদিরামের জন্ম দিয়েছিল। মৃত্যু সময় তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নির্ভীক। দীপ্তকণ্ঠে তিনি বন্দেমাতরাম ধ্বনিতে মুখরিত করে তুলেছিলেন ফাঁসির মঞ্চ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, স্বদেশী চেতনা, ব্রিটিশ সরকারের কঠোর দমন-পীড়ন নীতির বিরুদ্ধে ছিল তাঁর সংগ্রাম। বাঙালির জাতীয়তাবাদীদের উপর নিষ্ঠুর দমন-পীড়নকারী, কুখ্যাত

ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করা ছিল তার মূল লক্ষ্য কিন্তু ভুল করে মিসেস কেনেডি ও তার মেয়েকে বোমা মেরে হত্যা করেন। বিচারে **১৩**ই জুন **১৯০৮** সালে তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়। হাসতে হাসতে তিনি ফাঁসির দড়ি গলায় পড়েন এবং শেষ ইচ্ছা হিসেবে তিনি "বন্দেমাতরম" গান শুনতে চান। তিনিই হলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ শহীদ বিপ্লবী। তাঁর আত্মবলিদান সমগ্র দেশের তরুণ সমাজকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করে তুলতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি হয়ে ওঠেন শহীদ, সাহস ও দেশপ্রেমের প্রতীক। তাঁর অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে হাজার হাজার তরুণ সমাজ দেশমাতৃকার সেবায় আত্মবলিদান দিতে এগিয়ে আসেন। ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ এর মত বহু স্বদেশ সংগ্রামী, বিপ্লবীবীর দেশমাতৃকাকে শৃঙ্খলামুক্ত করতে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন। তাঁর এই আত্মবলিদান ভারতের সমগ্র যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করে এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরো ত্বরান্বিত করে তোলে। তাঁকে কেন্দ্র করে বহু বীরগাথা, লোকসংগীত, উপন্যাস, নাটক রচিত হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধটি কাজী নজরুল ইসলামের **'ক্ষুদিরামের মা'** এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বাধীনতাকামী, প্রকৃত স্বদেশপ্রেমী কাজী নজরুল ইসলাম ক্ষুদিরামের আত্মবলিদানে উদ্দীপ্ত হয়ে এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন।

আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক ক্ষুদিরামের মায়ের মত সমগ্র ভারতের মাতাকে তার বীর সন্তানদের ভারতমাতার শৃঙ্খমুক্ত করার জন্য, এবং তাদেরকেও (মায়েদের) দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। ক্ষুদিরামের মতই তাদের সন্তানও যেন প্রকৃত স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে ব্রিটিশ সরকারের সুশিক্ষিত সাম্রাজ্যের ধ্বংস লীলায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। সেইসঙ্গে ভারতের তরুণ যুবসমাজকেও আহ্বান জানিয়েছেন পরাধীন ভারতমাতাকে স্বাধীন করার জন্য। ক্ষুদিরামের মায়ের নিজের ছেলের এই আত্মবলিদানের জন্য তাঁকে জাতীয় জননীতে পরিণত করেছে। তাই ক্ষুদিরামের মা হল সমগ্র ভারতীয় বীর বিপ্লবীদের জননী। ক্ষুদিরাম ছেলেবেলায় মাকে হারানোয়- "পেয়েছিল সারা দেশের মায়েদের।"[৯] মায়ের অতৃপ্ত স্নেহ পূরণ করার জন্য তিনি পুনরায় আবার মাসির কোলে ফিরে আসতে চেয়েছেন। এখন প্রশ্ন হল নিজের মায়ের কোলে তিনি ফিরে আসতে চাননি কেন? প্রাবন্ধিক রূপকের মধ্য দিয়ে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন।

> "মায়ের সাড়া পায় নাই, মারা তাকে কোলে নেয় নি, তাই অভিমানে সে আত্ম বলিদান দিয়ে আত্ম- নির্যাতন করে মায়েদের অনাদরের প্রতিশোধ নিয়েছে।"[১০]

ক্ষুদিরাম দেখেছেন স্বদেশের প্রতি মায়েদের উদাসীনতা। তাঁরা তাঁদের সন্তানকে নিজের স্নেহ মায়া-মমতা থেকে বিচ্যুতি করতে পারেনি। মায়েরা সন্তানদের প্রকৃত স্বদেশ প্রেমের দীক্ষা, স্বদেশ প্রেমের উদ্দিপ্ত হওয়া, দেশকে স্বাধীন করার আদর্শ শিক্ষা মাতাগণ তাদের সন্তানকে দিতে পারেনি। তাই তিনি অভিমান করে মাসির কোলে জন্ম নিতে চেয়েছেন। প্রাবন্ধিক সেই সব জননীদের কাছে প্রশ্ন করেছেন,

> "ওই মাতৃহারা তোমাদেরই মুক্তির জন্য ফাঁসিতে যাওয়ার কথা শোনার পরেও কি তোমরা নিজেদের দুলালদেরে বুকে করে শুয়ে থাকতে যন্ত্রণা পাও না? ঐ মাতৃহারা মরা লাশ কি তোমাদের মা ও ছেলের মধ্যে সেই একটা ব্যবধানের পীড়া দেয় না?"[১১]

তাই প্রাবন্ধিক নজরুল ইসলাম সমগ্র ভারতের মাতাদের কাছে করজোড়ে আহ্বান জানিয়েছেন তাঁদের বীর সন্তানদের ভারত মাতার শৃঙ্খলামুক্ত করার জন্য দেশমাতৃকার চরণে বিসর্জন দিতে। প্রাবন্ধিক দেশের সমগ্র মায়েদের উদ্দীপ্ত করতে, তাঁদের অন্তরে স্বদেশের প্রেম ভাবনা জাগিয়ে তুলতে ক্ষুদিরামের এই আত্ম বলিদান এবং ক্ষুদিরামের মতো হাজার হাজার বিপ্লবী তরুণ সমাজের আত্ম উৎসর্গের কথা তুলে ধরেছেন।

প্রাবন্ধিক নজরুল জানিয়েছেন শহীদের আত্মবলিদান কখনো বৃথা যায় না। ক্ষুদিরামের জননী আজ জাতীয় জননী হয়ে উঠেছে। বীরবিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরাম আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে বাংলার ঘরে ঘরে জন্ম নিয়েছে

কোটি কোটি ক্ষুদিরাম। মাতৃস্নেহে অন্ধ মায়েরা বুঝতে পারিনি যে তাদের কোলে ক্ষুদিরামরূপী সন্তানের জন্ম হয়েছে। নজরুল তাই এই মায়েদের প্রতি বিনীত আহব্বান জানিয়েছেন তার সন্তানদের যেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্দীপ্ত করেন। ক্ষুদিরামরূপী এই সন্তানরাই পারবে দেশমাতৃকার শৃংখল মুক্ত করতে। কারণ তাদের জন্ম হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের সমস্ত রকম অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে। প্রাবন্ধিক মনে করেন দেশের সমস্ত জননীর উচিত তাদের পাশে থেকে বীরসন্তানদের সাহস জোগানো। বীর সন্তানদের মত মায়েদেরও উচিত মাতৃস্নেহ বিসর্জন দিয়ে দেশকে পরাধীন মুক্ত করা। মায়েরা যদি এই অসাধ্য কাজ সাধ্য করতে পারে তবেই ভারতের নতুন সূর্যের উদয় হবে। যে উদ্দেশ্যে হাজার হাজার ক্ষুদিরামরূপী তরুণের জন্ম হয়েছে, যারা হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চকে আপন করে নিয়েছে, ভারতকে ব্রিটিশ সরকারের পরাধীনতার হাত থেকে রক্ষা করতে যাদের জন্ম হয়েছে, তবে তাদের জীবন সার্থক। সেই সঙ্গে সার্থক মায়েদের মাতৃত্ব।

নজরুলের লেখনীতে প্রতিবাদ, ধর্মীয় নিরপেক্ষতা এবং মানবতাবাদ এই দিকগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। যেখানেই সাম্প্রদায়িক হিংসা, ধর্মান্ধতা, অন্ধবিশ্বাস- সংস্কার হীনতা, মানবতাবাদের নির্মম হত্যা হয়েছে সেখানেই তিনি গর্জে উঠেছেন। স্বার্থান্ধ মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য ধর্মকে কাজে লাগিয়ে থাকে। আর এই কাজের পরোচনা যোগায় তথাকথিত ধর্মগুরুরা। মন্দির-মসজিদের নামে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ একে অপরের উপরে আঘাত হানে। কিন্তু তারা গভীরভাবে বিচার করে দেখে না যে , আখের ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষই। যারা ধর্ম রূপ চোলায় মদের দোকান চালায় তাদের কাজ হচ্ছে সস্তায় ধর্ম বিক্রি করা। প্রাবন্ধিক বলেছেন- "ইহারা ধর্মে মাতাল। ইহারা সত্যের আলো পান করে নাই, শাস্ত্রের এলকোহল পান করিয়াছে।"[১২] তাইতো এরা কোন কিছু না বুঝে ধর্মে নেশাগ্রস্ত হয়ে বিধর্মী মানুষকে খুন করে। প্রকৃত অর্থে তাদের কোন জাত নেই। তারা শূকরের চেয়েও কুৎসিত , হিংস্র জন্তুর চেয়েও ভয়ানক। আর ইহাদের যে প্ররোচনা দেয় সে শয়তানের চেয়েও অধম। প্রকৃত ধর্ম মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে, মানবতা ও বিশ্ব কল্যাণবোধে উদ্দীপ্ত করে। তার মধ্যে ন্যায়-নীতিবোধ গড়ে তোলে। অন্যায় কাজ থেকে বিরত করে। মানবজাতির কল্যাণ কামনা করে। কিন্তু সেই ধর্ম যখন ক্ষমতার আস্ফলন হয়, দম্ভ - অহংকার প্রতীক হয় এবং তা যখন রাজনীতি দ্বারা পরিচালিত হয় তখন তা মানবজাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কাজী নজরুল ইসলাম **'মন্দির ও মসজিদ'** প্রবন্ধটির মধ্য দিয়ে এই মানবতাবাদেরই গুনগান করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ধর্মের ঊর্ধ্বে মানুষ। "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" চন্ডীদাসের এই মতের সঙ্গে তিনি পুরোপুরি একমত হয়ে জানিয়েছেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যখন একে অপরকে রক্তাক্ত করে তোলে তখন তাদের রক্তের রং কখনো আলাদা হয় না। আল্লাহ বা ভগবান কেই তাদেরকে বাঁচাতে পারে না। তারা একই ভাষায় আর্তনাদ করে "বাবা গো, মা গো।" কিন্তু এই বিপদের দিনে একমাত্র রক্ষা করতে পারে মানুষই। প্রকৃত ধর্ম মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে না। প্রতিটি ধর্মেই মানব কল্যাণের কথা বলে। কিন্তু ধর্মের ঠিকাদার, ধর্ম ব্যবসায়ীরা ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করে। মানুষকে বিপথে পরিচলিত করে। সাম্প্রদায়িক হানাহানি, দাঙ্গা ঘটে তার মূলে থাকে ধর্মগুরু বা রাজনৈতিক ক্ষমতাসীন শাসক। তাদের স্বার্থসিদ্ধির বলি হয় সাধারণ মানুষ। 'মন্দির ও মসজিদ' প্রবন্ধটিতে নজরুল ইসলাম সমাজের প্রতি এক ধিক্কার ও একগুচ্ছ প্রশ্ন ছুরেছেন। ভণ্ড – মেকিধর্ম ও সামাজের নিষ্ঠুরতা তাকে ব্যাথিত করেছে। তাই তিনি ধর্ম ও সমাজ উভয়েরই প্রতি প্রতিবাদ করেছেন। সামাজিক অন্যায় ও ব্যভিচার মানুষের জীবনকে করে তুলেছে দুর্বিসহ। ন্যায্য অধিকার থেকে করেছে বঞ্চিত। সামাজিক ন্যায়-নীতি মূল্যবোধকে করে তুলেছে ভুলণ্ঠিত। তাইতো "নবজাত শিশু এই দুঃখের পৃথিবীতে আসার প্রতিবাদ করেছিল।" এই সমাজের মানুষ এতটাই নির্মম যে একজন ভিখারী মাতা সমাজের দুর্বৃত্ত মানুষের লোভের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে

পারে না। সেই মাতা পেটের ক্ষুধার কাছে তার দেহ বিক্রি করতে বাধ্য হয়। আর তার বৈশাচিক আনন্দে একশ্রেণীর মানুষ উল্লাসিত হয়ে ওঠে। হায়রে সমাজ। দুর্ভাগিনী এক মাতা তার শিশুসন্তানকে বাঁচানোর জন্য সকলের কাছে গেলেও এতটুকু সাহায্য মেলেনা। সমাজের এই করুণ দৃশ্য প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিতে প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে দাঁড়ায়। যে সমাজ লক্ষ লক্ষ শিশুকে অনাহারে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়, তার কাছে ধর্ম, মন্দির-মসজিদ কোন নৈতিকতার দাবি করতে পারে না। ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে মানুষের মঙ্গলের বা কল্যাণের জন্য, কিন্তু মানুষ সৃষ্টি হয়েছে ধর্মের জন্য নয়। তাই নজরুল মনে করেন যদি মন্দির-মসজিদ প্রকৃত মানুষের কল্যাণকারী না হয় তাহলে তা ভেঙে ফেলাই শ্রেয়। 'পথের দিশা' কবিতা তিনি বলেছেন-

"মসজিদ আর মন্দির ঐ শয়তানদের মন্ত্রণাগার,
রে অগ্রদূত, ভাঙতে এবার আসছে কি জাঠ কালাপাহাড়?"

তবে প্রাবন্ধিক আশাবাদী। এই তরুণ সমাজই পারবে, এসব কিছুর অবসান ঘটাতে। একটা সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। প্রকৃত মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে। তরুণরাই পারবে সমস্ত রকম ধর্মান্ধতা, মেকি ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় রাজনীতির অবসান ঘটাতে। জাতি ও ধর্মের ঊর্ধে উঠে প্রকৃত মানবপ্রেমের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে।

নজরুল ছিলেন মনে-প্রাণে প্রকৃত অর্থে মানবতাবাদী। এ প্রসঙ্গে সুধীর মল্লিক তাঁর 'মানবতাবাদী নজরুল' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন– "নজরুলের মানবতা দরিদ্র দু:স্থ বঞ্চিত সম্প্রদায়ের দুর্দশার বাস্তব অভিজ্ঞতা ও একাত্মবোধের গভীর আবেগ ভিত্তিক। চিন্তাভাবনা যুক্তি মনন সবকিছু উর্ধ্বে।"[১৩] তিনি ছিলেন উদার ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রতীক। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন ধর্মীয় গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে। স্ত্রী প্রমিলাকে তিনি তার নিজ ধর্মাচরণে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। গোঁড়া মৌলবীর ছেলে হয়েও সর্বপ্রকার সংকীর্ণ ধর্মীয় সম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে ছিলেন তিনি। তার সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টি অসাম্প্রদায়িকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভাষা, ছন্দ, সুর সবকিছুই আমাদের মনকে আপ্লুত করে; উদ্দীপ্ত করে।

তিনি মানবতাবাদী কবি, তাই সর্বত্র মানুষের কথাই বলেছেন। হিন্দু-মুসলিম দুই ধর্মের সাম্প্রদায়িক বিরোধের মূল অনুসন্ধান করার চেষ্টা চালিয়েছেন। মানবিক চেতনা, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, মননশীল চিন্তন ও চেতনার মধ্যদিয়ে তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। হিন্দু ও মুসলিম এ দুটি সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরেই একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাব পোষণ করেছে। ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষ যখন নিজেকে অন্যের থেকে আলাদা ভাবতে শুরু করে, অন্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, অন্যের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ মনোভাব পোষণ করে তখনই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিবিনষ্ট হয়। অনেক ক্ষেত্রেই একে অপরের উপর আক্রমণ চালিয়েছে এর কারণ প্রাবন্ধিক 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে জানিয়েছেন- "আজ যে মারামারিটা বেধেছে সেটাও এই পন্ডিত-মোল্লায় মারামারি, হিন্দু-মুসলমানে মারামারি নয়।"[১৪] প্রাবন্ধিকের মতে "টিকিত্ব-দাড়িত্ব অসহ্য কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাধাই"। টিকি এবং দাঁড়ি এই দুটো চিহ্নই মানুষকে একে ওপরের থেকে আলাদা করে দেয়। মৌলবী এবং পুরোহিত তারা তাদের নিজের স্বার্থসিদ্ধি কায়েম করার জন্যই দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি করে। ধর্মকে ভুল পথে পরিচালিত করে একে অপরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ ছড়ায়। কিন্তু ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়- একথা তারা ভুলে যান। তাইতো মানবতাবাদী কবি নজরুলকে বারবার সেকথা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। "নারায়ণের গোদা আর আল্লাহর তলোয়ার কোনদিনই ঠোকাঠুকি বাধবে না, কারণ তারা দুজনেই এক, তাঁর এক হাতের অস্ত্র তাঁরই আর এক হাতের উপর পড়বে না।" ঈশ্বরের যে অবতার হয় তার মূল কারণ মানুষের মুক্তি ও বিশ্বকল্যাণের জন্য। নিজের দেবত্ব প্রদর্শন করার জন্য নয়। হিংসা-বিদ্বেষ-ঘৃণা ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, যদি কোন মানুষ মরনাপন্ন অবস্থায় পড়ে থাকে তাকে

উদ্ধার করার আগে তার ধর্ম জানতে চাওয়া হয়। তার বাহ্যিক চিহ্ন টিকি না দাড়ি তা দেখে, বিচার করে তবে তাকে উদ্ধার করতে চায়। মানুষের মধ্য থেকে মানবিকতা, নৈতিক মূল্যবোধ সব হারিয়ে যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে তার মধ্যে পশুত্বপ্রাপ্তি ঘটছে। নজরুলের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন- "যে ল্যাজ বাইরের তাকে কাটা যায়, কিন্তু ভেতরের ল্যাজকে কাটবে কে?"[১৫] অর্থাৎ এই ভিতরের ল্যাজ হল ধর্মান্ধ মানুষের ভেতরের হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ। শিংযুক্ত পশুর চেয়ে শিংহীন ব্যাঘ্র ,ভাল্লুক বড় ভয়ংকর। সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টিকারী মানুষের মধ্যে আজ পশুত্বপ্রাপ্তি দেখা দিয়েছে যা অনেকটাই শিংহীন ব্যাঘ্র-ভাল্লুক তুল্য। তাই প্রবন্ধটিতে লেখক ব্যঙ্গ করে বলেছেন পশুর ল্যাজ ঝরে যাচ্ছে, মানুষের ল্যাজ গজাচ্ছে। মানুষের মধ্যে পশুর মত আচরণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধর্মের বাহ্যিক চিহ্ন (টিকি- দাড়ি) নয় মানবতাবোধই হোক আর আসল পরিচয়।

ধূমকেতুর আবির্ভাব এবং তিরোধান যেমন আকস্মিক তেমনি ধ্বংসাত্মক ও সৃষ্টির সম্ভাবনাময়ী। কাজী ইসলামে সম্পাদিত এই 'ধূমকেতু' পত্রিকা (১১ ই আগস্ট ১৯২২ - মার্চ ১৯২৩) মাত্র কয়েক মাসের জন্য তার আগমন হয়েছিল; সাহিত্য, রাজনীতির প্রচুর সম্ভাবনা নিয়ে। পত্রিকার জ্বালাময়ী অগ্নিবিচ্ছুরণে ব্রিটিশ সরকারের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল তাই রাজরোষানালে পড়ে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

দেশের জনগণের মধ্যে স্বদেশচেতনা, মানতাবাদী মনোভাবের বিকাশ ও বিপ্লবী চিন্তন-চেতনার জাগরণের মধ্য দিয়ে পত্রিকার আবির্ভাব। প্রাবন্ধিক নজরুল ছিলেন এই পত্রিকার সারথি। স্পষ্ট ভাষা জানিয়েছেন তার সম্পাদিত 'ধূমকেতুর' মূল উদ্দেশ্য ছিল 'ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা'। আর এই পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনে প্রয়োজন আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ ভারতবাসীর চরমপন্থানীতি ও সশস্ত্র সংগ্রাম। কারণ তিনি মনে করেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন নীতি নিছক পরিহাস মাত্র। তাই পূর্ণস্বাধীনতা ব্রিটিশ সরকারের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। প্রাবন্ধিক **'ধূমকেতুর পথ'** প্রবন্ধে বলেছেন-

> "ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশ বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব,সম্পূর্ণ স্বাধীনতা- রক্ষা, শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে"[১৬]

এই পূর্ণস্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস। নিজেকে বোঝা, নিজের মতামতকে সম্মান জানানো। অন্যের মতাদর্শ সমর্থন করার আগে নিজের মতাদর্শের সঙ্গে অন্যের মতাদর্শ বিচার করা; যদি মনে হয় তাঁর মত গ্রহণযোগ্য অবশ্যই তা সমর্থন করা উচিত না হলে নির্দ্বিধায় তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। নজরুল এই প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ, ঋষি অরবিন্দ এবং মহাত্মা গান্ধী প্রসঙ্গ তুলে নিয়ে বলেছেন যদি মনে হয় পূর্ণস্বাধীনতা অর্জনে তাঁদের মতাদর্শ গ্রহণযোগ্য তো অবশ্যই তা গ্রহণ করা উচিত; আর যদি মনে হয় তাঁর মতের সাথে নিজের মত মিলছে না এবং তা পূর্ণস্বাধীনতা অর্জনের পক্ষে বাঁধা তা নির্দ্বিধায় সসম্মানে ত্যাগ করা উচিত। "আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।" নিজের মন যা চায় তাই করা উচিত। সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, নিজের প্রতি বিশ্বাস এই সৎ গুনগুলি একজন ব্যক্তির মধ্যে প্রকৃত দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলে। লোক দেখানো প্রশংসা অর্জনের জন্য সত্যকে কখনো বিসর্জন না দেওয়া, না বুঝে অন্যের মতাদর্শকে গ্রহণ করা, স্বদেশ ও বিপ্লবী চিন্তন-চেতনার প্রতি আনুগত্য থাকা, এই মহৎ গুণগুলি একজন স্বদেশপ্রেমীর কাছে থাকা উচিত। অনুতাপ এবং আত্মপ্রবঞ্চনা একজন স্বদেশ সংগ্রামীকে দুর্বল করে তোলে। আত্মপ্রবঞ্চনা নরক - যন্ত্রণা তুল্য। 'ধূমকেতু' স্বদেশ সংগ্রামী বীর বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দেয় যারা দেশসেবার কাজে এগিয়ে আসতে চায় তাঁদের মধ্যে সমস্ত রকম দুর্বলতা থেকে মুক্ত হয়ে, শ্রদ্ধা-প্রশংসা পাবার লোভ থেকে বিরত হয়ে, সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা রেখে এবং নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। নজরুলের এই 'ধূমকেতু' পত্রিকায় সাড়া দিয়ে শতশত তরুণ বীরবিপ্লবী ভারত মাতার মুক্তির জন্য

এগিয়ে আসে। যা ব্রিটিশ সরকারের মাথাব্যথা কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাজদ্রোহের অপরাধে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু বিপ্লবের যে বীজ পত্রিকাটি বপন করেছিল; তা ব্রিটিশ সরকারের সুসজ্জিত সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে ভারত মাতাকে শৃঙ্খলামুক্ত করেছিল।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. ইসলাম, আজাহার। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - আধুনিক যুগ। (ঢাকা: অনন্যা তৃতীয় সংস্কারন ২০০১), পৃ. ৪১০।
২. ইসলাম, রফিকুল সম্পাদিত। নজরুল রচনাবলী দ্বিতীয় খন্ড। বাংলা একাডেমী ঢাকা, নতুন সংস্করণ ১৯৯৩, পৃ. ৪১৯।
৩. তদেব, পৃ. ৪১৯।
৪. তদেব, পৃ. ৪১৯।
৫. তদেব, পৃ. ৪১৯-৪২০।
৬. তদেব, পৃ. ৪২১।
৭. তদেব, পৃ. ৪২৪।
৮. তদেব, পৃ. ৪২৫।
৯. তদেব, পৃ. ৪২৬।
১০. তদেব, পৃ. ৪২৬।
১১. তদেব, পৃ. ৪২৬।
১২. তদেব, পৃ. ৪৩২।
১৩. বিশ্বাস, অচিন্ত্য সম্পাদক। একবিংশতি-১ বিশেষ নজরুল ইসলাম সংখা। মে ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ, কলকাতা-৯৪, পৃ. ২২০।
১৪. ইসলাম রফিকুল সম্পাদিত, নজরুল রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড। বাংলা একাডেমী ঢাকা, নতুন সংস্করণ ১৯৯৩ পৃ. ৪৩৭।
১৫. তদেব, পৃ. ৪৩৬।
১৬. তদেব, পৃ. ৪২৮।